প্রথম অধ্যায়

হিন্দী ও বাংলা উপন্যাসের পারস্পরিক সম্পর্ক ও প্রভাব।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে ভারতবর্ষে উপন্যাস লেখার সূচনা হয় এবং শতাব্দী শেষ হবার আগে ভারতবর্ষে এই নতুন সাহিত্যরূপটি জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। উনবিংশ শতাব্দীর ভারতীয় উপন্যাসে বাংলা উপন্যাসের অগ্রবর্তী ভূমিকা ছিল অনস্বীকার্য। যদিও মারাঠী ও বাংলা উপন্যাসের জন্ম ও বিবর্তন প্রায় একই সঙ্গে হয়েছিল - এবং সংখ্যার দিক থেকে উনিশ শতকে প্রকাশিত উপন্যাস উভয় ভাষায় সমতুল্য। তবুও সেদিন বাংলার প্রভাব মারাঠীর উপর ছিল একতরফা। মারাঠী ব্যতীত বাংলা উপন্যাসের প্রভাব অন্যান্য যে কয়েকটি ভারতীয় ভাষায় রচিত উপন্যাসের মধ্যে সক্রিয় ছিল হিন্দী তার অন্যতম। ভারতীয় উপন্যাসের আদিপর্বে বাংলা ও হিন্দী উপন্যাসের এই যোগাযোগ পরবর্তীকালে অনেক সুফল দিয়েছে।। এই দুই ভাষায় রচিত সৃজন সাহিত্যের যোগাযোগ অনেক পুরনো এবং ঐতিহ্যমন্ডিত। এই ঐতিহ্যের সূত্র ধরেই সতীনাথ ভাদুড়ী ও ফণীশ্বর নাথ রেনুর সৃজন ক্রিয়ার তুলনাত্মক সমীক্ষায় ব্রতী হয়েছি, ভারতীয় উপন্যাসের ক্ষেত্রে হিন্দী ও বাংলা উপন্যাসের যোগাযোগ ও তার বিস্তার কিভাবে ঘটল তা উক্ত-সমীক্ষার প্রাক্-কথন হিসেবে তুলে ধরছি।

উপন্যাস যেমন আধুনিক কালের সৃষ্টি, তেমনি ভারতবর্ষে প্রাদেশিকতার সংজ্ঞাটিও আধুনিক কালের। বাংলার প্রতিবেশী রাজ্য বিহার। এই বিহার থেকে পাঞ্জাব, এই বিরাট এলাকা জুড়ে হিন্দীভাষার বিস্তার। তখন সর্বভারতীয় যোগাযোগের রাস্তা এত প্রশস্ত ছিল না এবং দেশে এখনকার মতো রাজনৈতিক ঐক্যবোধও জন্মায়নি। কিন্তু তখন ভারতবর্ষের এক অঞ্চলকে অন্য অঞ্চল অনেক বেশী বুঝত। দেশ-দেশান্তরের মানুষের বন্ধনের সূচনা হয়েছিল ধর্মের বন্ধনে। ভাষাও ধরা দিয়েছিল এই বন্ধনে। দক্ষিনের শ্রী বৈষ্ণবদের দর্শন ও আলোয়ার-দের ভক্তি সাহিত্য বাঙালী বৈষ্ণবদের প্রেরণা দিয়েছিল। উত্তর ভারতীয় সন্তদের রচনা পৌঁছে ছিল রাজস্থানে, গুজরাটে, মহারাষ্ট্রে। আসামের মহাপুরুষিয়ারা এবং উড়িষ্যার ভাগবতকাররা প্রেরণা পেয়েছিলেন গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের রচনা থেকে। রাজস্থানে মীরা, উত্তর প্রদেশে দাদু, কবীর, মিথিলার বিদ্যাপতি, বাংলার বড়ু চন্ডীদাস, গুজরাটে নরসিংহ-মেহতা, মহারাষ্ট্রে

তুকারাম একই ভাবের পদাবলী লিখেছেন, এ আকস্মিক নয়। ভ্রাম্যমান সাধু-ফকির, তীর্থযাত্রী ও বনিকের মারফত গানের আকারে ভেসে গিয়েছে এই সাহিত্য।

এই সর্ব-ভারতীয় সাংস্কৃতিক অখণ্ডতার প্রবাহে বাংলা যেমন অন্যপ্রদেশ হতে সাহিত্যের উপাদান সংগ্রহ করেছে, অন্যপ্রদেশও তেমনি বাংলার কাছ থেকে নিজেদের প্রয়োজনে বাংলা সাহিত্য থেকে উপাদান সংগ্রহ করেছে। হাজার বছর পূর্বে বৌদ্ধগান ও দোঁহা রচনায় বাঙালী কবিরা, প্রাচীনতম বাংলা ভাষার সঙ্গে শৌরসেনী অপভ্রংশে (হিন্দীর প্রাগ্‌-গী ভাষা) কবিতা রচনায় দ্বিধাবোধ করেননি। বাংলার সাথে 'ব্রজবুলি'তে পদ রচিত হয়েছে পাঁচশ বছর ধরে। শ্রী চৈতন্যের যুগ থেকে রবীন্দ্র নাথের সময় অবধি কবিরা হিন্দীর সাথে হাত মিলিয়ে ছিলেন কোথাও শব্দের প্রয়োজনে (বৈষ্ণব পদাবলী হতে ভারতচন্দ্র) কোথাও ভাবের প্রয়োজনে (যেমন আলাওলের পদ্মাবতী)। এই সব ঘটনাকে বাংলা ও হিন্দী উপন্যাসের পারস্পরিক সম্পর্কের আদি উৎস বললে অত্যুক্তি হয় না।

বাংলা ও হিন্দী উভয় ভাষাতেই অন্যতম তরুন সাহিত্য শাখা উপন্যাস। উপন্যাসের জন্য চাই গদ্য। আদি পর্বে যে কোন নবীন ভারতীয় আর্যভাষার পুরাতন সাহিত্যে গদ্যের সাহিত্য মর্যাদা ছিল না। বাংলার মত হিন্দী সাহিত্যের ক্ষেত্রেও এর অন্যথা হয়নি। বাংলা ও হিন্দী উভয় ভাষায় রচিত সাহিত্যের ক্ষেত্রেই কাব্য সূচনা পর্ব থেকে চলে আসছে, নাটক ও কাব্যের প্রায় সমকালীন। উপন্যাসই দুই ভাষার নবীন সাহিত্য শাখা। তবে দুই ভাষাতেই প্রাগাধুনিক কালে কাহিনী বা কিস্‌সার যোগসূত্র উপন্যাস রচনার প্রারম্ভিক পর্বে ছিল। কাহিনী কথন-শ্রবনের প্রথাই হচ্ছে উপন্যাস সাহিত্যের মূল। কখনো কাহিনী বিবৃত হত পদ্যে (পাঁচালী, সাগা, টেল, কিস্‌সা ইত্যাদি নামে) কখনো গদ্যে। প্রাক্‌ উপন্যাস কথা সাহিত্যে যেমন 'কাদম্বরী' 'পঞ্চতন্ত্র' আমরা দেখি গল্পের মধ্যে গল্প, তার মধ্যে গল্প - অথবা বৃহৎ কাহিনীর সূত্রে ছোট-ছোট কাহিনী গ্রথিত। পৃথিবীর প্রায় সবদেশের সাহিত্যেই এক যুগে এই ধরনের দীর্ঘ কাহিনীর গ্রন্থি বা কথামালা পাওয়া যায়, যদিও তা সব সময় গদ্যে রচিত নয়।

এ সবই ভারতীয় উপন্যাসের প্রত্নরূপ। উপন্যাস কি ভারতীয় সাহিত্যের বহিরাগত ধারা ? কেবলই ঔপনিবেশিক আমদানী মাত্র ? সপ্তদশ শতাব্দীতে ভারতবর্ষে লেখা বানভট্টের কাহিনীকে কি উপন্যাস পদবাচ্য করা যাবে না ? এই সব নিয়ে বিতর্ক তোলা যেতে পারে ! তবে এই নিয়ে সংশয় নেই যে ভারতীয় ঔপন্যাসিকরা নবনির্মিত উপন্যাসের ফর্ম কমবেশী ইংরেজী নভেল থেকে গ্রহন করেছিলেন। "কথা সাহিত্যের যে রূপকে বাংলায় উপন্যাস বলা হয় মারাঠী ভাষায় তার নাম কাদম্বরী। বানভট্টকে এই সাহিত্যরূপের স্রষ্টা বলে ধরে নেওয়াই এই নামকরণের মূল কারণ। উপন্যাস শব্দটি বাংলায় নভেল অর্থে প্রথম ব্যবহৃত হয় বোধ হয় ১৮৫৭ সালে, ভূদেব মুখোপাধ্যায়-এর ঐতিহাসিক উপন্যাসের শীর্ষে। মারাঠী ভাষায় কাদম্বরী শব্দটি আরো একটু প্রাচীন, কারণ ১৮২১ সালে মনস্টুয়ার্ট এলফিনস্টোনের তত্ত্বাবধানে রচিত এক মারাঠী অভিধানে এই শব্দটি উপন্যাস অর্থে ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। অবশ্য আজ সকলেই মেনে নেবেন যে এই সাহিত্যরূপকে যে নামেই ডাকা যাক না কেন, এর সচেতন আদর্শ ছিল ইংরাজি নভেল - সংস্কৃত কথাসাহিত্য নয়।"[১]

প্রাগাধুনিক ভারতীয় সাহিত্যে ও সাধনক্ষেত্রে বাংলার সঙ্গে হিন্দীভাষী অঞ্চলের গভীর যোগাযোগ ছিল। পরবর্তীকালে বাংলার প্রাণকেন্দ্র কলকাতা কেবল ইংরেজদের দ্বারা রাজধাণীই শুধু হয় নি সারা ভারতবর্ষের শিক্ষা-সংস্কৃতি চর্চার প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল। কলকাতা যেমন বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রসারে এক বিরাট ভূমিকা নিয়েছিল, তেমনি অন্যান্য ভারতীয় ভাষার ক্ষেত্রে ছিল প্রেরণাস্বরূপ। উনিশ শতকের বাংলার নবজাগরনের ফলশ্রুতি সারাভারতের প্রেক্ষাপটেই বিবেচ্য। বাংলার সাহিত্যিক অভ্যুত্থানের কেন্দ্র বিন্দু থেকে তরঙ্গবৃত্ত ছড়িয়েছে ভারতভূমির চতুর্দিকে। বাংলা গদ্যে বঙ্কিম এবং কাব্যে মধুসূদন যে নবযুগের সূচনা করেছিলেন তার প্রভাব ভারতের অনেক প্রাদেশিক সাহিত্যে নবজীবনের সঞ্চার করল। হিন্দীর ক্ষেত্রেও এই প্রভাব অন্যথা হয়নি। পরবর্তী কালে দ্বিজেন্দ্র লালের নাটক, রবীন্দ্রনাথের কবিতা, শরৎচন্দ্রের উপন্যাস এই প্রভাবকে আরো অগ্রগামী করেছিল। আমাদের আলোচনার বিষয়বস্তু কথাসাহিত্য তথা উপন্যাস। এ ক্ষেত্রেই আলোচনাকে সীমাবদ্ধ রাখব। শুধু মাত্র সংস্কৃতির ক্ষেত্রে অগ্রবর্তী ছিল বলেই কি হিন্দী উপন্যাসের উপর বাংলার প্রভাব পড়েছিল ? না শুধু এইটুকুই নয় হিন্দীর উপর বাংলার প্রভাব বিস্তৃতির কারণ আরো গভীর কিছু।'

"ভারতবর্ষে উপন্যাস রচনা আরম্ভের সঙ্গে ইংরেজি শিক্ষার বিশেষ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। মেকলের বিখ্যাত শিক্ষাবিষয়ক পন্থা ১৮৩৫ সালে গৃহীত হবার কুড়ি তিরিশ বছরের মধ্যে যে হঠাৎ প্রায় একই সঙ্গে বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় উপন্যাস লেখা আরম্ভ হয়ে যায়"।[২] (মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায় তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'রিয়ালিজম্ এ্যান্ড রিয়ালিটি : দি নভেল এ্যান্ড সোসাইটি ইন ইন্ডিয়া। দিল্লী, অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৮৫'র পরিশিষ্টে ভারতীয় উপন্যাসের একশ বছরের তালিকা নির্মান করেছেন। এখানে ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের ভাষায় রচিত উপন্যাসগুলির সাথে বাংলা উপন্যাসগুলি লক্ষনীয়।

১৭৫৭ সালের পলাশীর যুদ্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাসে এক যুগান্তকারী ঘটনা। রাজনীতির ক্ষেত্রে শুরু হল ব্রিটিশ প্রভুত্বের। বৃটিশ অধিকারের উদ্যোগ পর্বে ইংরেজদের প্রসাদপুষ্ট হয়েছিল তিনটি বন্দর শহর - কলকাতা, বোম্বাই-মাদ্রাজ। প্রশ্ন তোলা যেতে পারে হিন্দী সাহিত্য ক্ষেত্রে বোম্বাই-মাদ্রাজ অপেক্ষা কলকাতার গুরুত্ব কেন ? আর্য-সংস্কারের শেষপর্বে বাংলার দীক্ষাগ্রহন বলেই হোক বা যে কোন কারনেই হোক সনাতনী মনোভাব বাংলার কিছু কম ছিল। ইংরেজীয়ানা আর পশ্চিমী সংস্কৃতি বাংলার মানুষরাই গ্রহন করেছিল বেশী মাত্রায় তাই 'ইয়ং বেঙ্গল' প্রসিদ্ধ হলেও 'ইয়ং মাদ্রাজ' বা 'ইয়ং বোম্বাই' অভিধা তেমন পরিচিত নয়। বাংলা দেশে নতুন ইংরাজী শিক্ষার প্রসার যত আগে হয়েছিল, হিন্দীভাষী অঞ্চলে তা দীর্ঘদিন বাদে হয়েছিল। এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের কথা উল্লেখ করে, বিষয়টিকে আরো স্পষ্ট করা যেতে পারে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয় ১৮৫৭ খ্রীঃতে আর হিন্দীভাষী অঞ্চলে (বিহার থেকে পাঞ্জাবের সীমান্তে) বিশ্ব বিদ্যালয় স্থাপিত হল দীর্ঘদিন বাদে - পাঞ্জাবে ১৮৮২ খ্রী:তে, এলাহাবাদে ১৮৮৭ খ্রী:তে। বেনারসে ১৯১৬ খ্রী:তে, পাটনায় ১৯১৭ খ্রী:তে, লক্ষ্ণৌতে ১৯২০তে, আগ্রায় ১৯২৭এ। এই বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের সময় লক্ষ্য করে ধারনা করা যেতে পারে, হিন্দীভাষী অঞ্চলের প্রানকেন্দ্রে ইংরেজী সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ বাংলার মত হতে দীর্ঘদিন লেগেছিল।

বাংলা-বিহার-ওড়িষ্যা ব্রিটিশ শাসনে একই সাথে আবদ্ধ হয়েছিল। অবলীলাক্রমে কলকাতা হয়েছিল এই পূর্বাঞ্চলের প্রধান কেন্দ্র। ১৮৬২ সালে রেলপথের কল্যানে কলকাতার সাথে বেনারসের যোগাযোগ হল। বিহার এবং পূর্বী হিন্দির কেন্দ্রভূমি বেনারস থেকে কলকাতায় অবাঙালীদের যাতায়াত চলছিল নানাকর্মে, এঁদের কাছে বাংলাভাষা, মাদ্রাজ বা বোম্বাইয়ের ভাষার মত দূরের জিনিষ ছিল না। তাই পূর্বী হিন্দী অঞ্চলের মানুষেরা সহজেই কলকাতার সাথে যুক্ত হতে পেরেছিল।

কলকাতায় ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮০০ সালে। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ'এর পাঠ্যপুস্তক রচনার প্রয়াসকে কেন্দ্র করে বাংলা গদ্যে প্রথম কথা বা গল্পমূলক রচনা প্রকাশ পায়। বাংলাগদ্যের বিবর্তনের ইতিহাসে শুধু নয়, লক্ষণীয় হিন্দী গদ্য সাহিত্যের ক্রান্তি চিহ্ন ও ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে ছিল। শ্রীরামপুর মিশনে উইলিয়াম কেরীর উদ্যোগে ১৮০১ এ বাংলায় বাইবেল অনুবাদ যেমন ঐতিহাসিক ঘটনা, তেমনি হিন্দী বাইবেল অনুবাদ আংশিক ভাবে হয়েছিল ১৮০৯ এ, সমগ্র অনুবাদ হয়েছিল ১৮১৮তে। সুতরাং লক্ষণীয় যে শ্রীরামপুর মিশনের উদ্যোগ শুধু আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সূত্রপাত করেনি, হিন্দীরও করেছিল।

-"In connection with the revival of Hindi literature mention must also be made of the work being done about this time by William Carey and his colleagues Ward and Marshman at Srerampore. Amongst the many translations of the Christian Scriptures made by these missionaries were some in the dialects of Northern India. The Hindi version was Carey's own work. The first portions of his Hindi New Testament were published in 1809, and the Hindi translation of the whole Bible was completed in 1818".[3]

হিন্দীভাষা উত্তর ও মধ্যভারতে খুব ব্যাপক ভাবে ব্যবহৃত হলেও এই ভাষাটি কিন্তু কোনও একটি বিশেষ ভৌগোলিক অঞ্চল থেকে গড়ে ওঠেনি - যে রকম বাংলা, ওড়িয়া বা অসমীয়া আঞ্চলিক ভাষা হিসেবে গড়ে উঠেছে। হিন্দী ভাষা তার বিবিধ উপভাষা নিয়ে উত্তরপ্রদেশ, বিহার, মধ্য প্রদেশের বৃহৎ কিছু অংশ, রাজস্থান, দিল্লী, পাঞ্জাবের পূর্বাংশ এবং হিমাচল প্রদেশে বহুল ব্যবহৃত। স্বভাবতঃই হিন্দীভাষার ভৌগোলিক বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে তার আঞ্চলিক বিশেষত্বও গড়ে উঠেছে। তা সে যাই হোক, যাকে আমরা "হিন্দীভাষী এলাকা" বলি সেখানেও আগে অনেকগুলি উপভাষা ছিল এবং এখনো আছে। এই সব উপভাষার মধ্যে আওধি(বা কোশলী), ব্রজভাষা, ভোজপুরী এবং রাজস্থানের কোনও কোন অঞ্চলের উপভাষা। সন্তকবি তুলসীদাস তাঁর বিখ্যাত কাব্য 'রামচরিত মানস' রচনা করেন আওধি উপভাষায়। কবীরের ভজনগুলি রচিত হয়েছিল আওধি এবং ভোজপুরীর মিশ্রনে। কবি সুরদাস তাঁর রচনায় ব্যবহার করেছিলেন খাঁটি ব্রজভাষা। সুফীকবি মৌলানা দাউদ তার "চন্দায়ন" (লোর এবং তাঁর স্ত্রী চন্দা'র প্রেম কাহিনী। অন্য নাম 'লোর চন্দ্রানী' রচনা করেন আওধি উপভাষায়। মালিক মুহম্মদ জায়সীর 'পদ্মাবতী', যার বিষয়বস্তু ছিল রাজপুত বীরত্ব ও প্রেমের কাহিনী, সেটিও লেখা হয়েছিল সংস্কৃত প্রধান আওধিতে।

এই সব উপভাষার মধ্যে "খড়িবোলী" উপভাষা মধ্যযুগ থেকেই আস্তে আস্তে বিশিষ্ট হয়ে ওঠে। লাল্লুজী লাল(জন্ম অগ্রাহায়ন ১৭৬৩ খ্রীষ্টে - মৃত্যু ১৮৩৫ সালে) ইংরেজ পন্ডিত স্যার জেমস্ গ্রীল - খ্রাইস্টের উৎসাহে লেখেন খড়িবোলীতে তাঁর কাব্য 'প্রেমসাগর"। এই উপভাষাকে ভিত্তি করেই কলকাতার ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে হিন্দীভাষা শিক্ষার কার্যক্রম স্থির করা হয় উইলিয়াম কেরীর নেতৃত্বে। হিন্দুস্থানী গদ্য সাহিত্যের বিকাশে তারিণীচরণ মিত্রর সহযোগিতা বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ থেকে ১৮০৫ সালে 'বৈতালপচীসী'র সম্পাদনা করেছিলেন। এই পর্য্যায়ে চন্ডীচরন মুন্সীর 'তোতা ইতিহাস' ও উল্লেখযোগ্য। তবে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের লেখকদের এই গদ্য রচনায় বিশুদ্ধ সৃষ্টিধর্মী সাহিত্যরচনার প্রেরণা ছিলনা। গদ্য চর্চার ইতিহাসে এঁরা স্মরণীয়, কিন্তু সৃজনশীল গদ্যশিল্পী এঁরা ছিলেন না।

সাহিত্যের অন্যান্য প্রকরণের মতো, ভাষার সুষম সমন্বয়েই উপন্যাসের অবয়ব গঠিত হয়। এই ভাষার মাধ্যম গদ্যরীতি। বাংলা ও হিন্দী উভয় সাহিত্যেই গদ্য এসেছে পদ্যের পরে। বাংলা সাহিত্য সংসারে নবজাতক উপন্যাস যখন নিজের অস্তিত্ব ঘোষনার চেষ্টা করছে, তার মাধ্যম গদ্যরীতিরও তখন নিতান্ত বাল্যাবস্থা। গদ্যের মাধ্যমের সঠিক কোন রীতি উপন্যাস-সৃষ্টির সহায়ক সে নিয়ে দুশ্চিন্তা ছিল সূচনা পর্বের স্রষ্টাদের বংকিম চন্দ্রের এবং রবীন্দ্র নাথেরও। অনাধুনিক সাহিত্যে গদ্য সাহিত্য বলে কিছু ছিল না। আমাদের প্রশ্ন কথা গদ্য নিয়ে, যা উপন্যাস রচনার মাধ্যম। কথাসাহিত্য সৃষ্টির অনুকূল গদ্যভাষাই কথাগদ্য। যে অর্থে গদ্যসাহিত্যের বিশেষ বিশেষ যাঁরা কথা সাহিত্য বলে পরিগনিত, সেই সাহিত্যের ভাষাই কথাগদ্য। উইলিয়াম কেরী থেকে শুরু করে রামমোহন পর্যন্ত লেখক সমাজের কারও মধ্যেই বিশুদ্ধ সৃষ্টিধর্মী সাহিত্য রচনার প্রেরণা ছিল না। সচেতন গদ্যরীতির প্রয়াসও ছিল না। এই কৃতিত্বের অনেক অংশই দাবী করতে পারেন, পন্ডিত ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর।

বিদ্যাসাগরের আখ্যানমূলক রচনাগুলি মৌলিক রচনা নয় কিন্তু তার ভেতর দিয়ে যে অসাধারন গদ্যশৈলীর পরিচয় পাওয়া গিয়েছে তাতে নিঃসন্দেহে বিদ্যাসাগরের সাহিত্যবোধের পরিচয় সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। প্রকারান্তরে এই রচনাগুলিকে মৌলিক গদ্য রচনা না বলার কোন কারণ নেই। এক কথায় বলা যায় যে সম্ভবতঃ বিদ্যাসাগর বুঝতে পেরেছিলেন গদ্যকে যদি সাহিত্যের বাহন হিসেবে কাজে না লাগানো যায় তাহলে গদ্যসাহিত্যের প্রকৃত ক্ষমতা যাচাই করা যাবে না। বিদ্যাসাগর একটি যোগ্য গদ্যরীতি গড়ে তোলা অবশ্য প্রয়োজন বলে মনে করেছিলেন। কারন পঙ্গু গদ্যের সাহায্যে সমাজসংস্কার বা শিক্ষার মানোন্নয়নে বিশেষ এগোনো যায় না। এবং মানুষের চিত্তকে জাগানো যায় না, যদি যুক্তির ভাষাগদ্যের পর্যাপ্ত বিকাশ না ঘটে। এই সব প্রয়োজন সাধনের লক্ষ্যে যে চেষ্টা চলে আসছিল ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ থেকে, তাতে বিদ্যাসাগরের সচেতন ও অবিরাম চেষ্টায় বিস্ময়কর উন্নতি ঘটল।

'শকুন্তলা' 'সীতার বনবাস' এবং 'ভ্রান্তিবিলাস' - এই তিনটি বইয়ের সঙ্গে সমাজ-সংস্কার আন্দোলনের কোনো যোগ নেই, পাঠ্যপুস্তক রচনার উদ্দেশ্যও এদের পেছনে নিহিত ছিল না।

বয়স্ক ও রসজ্ঞ পাঠকের জন্য সৌন্দর্যোপভোগের আয়োজন করতে চেয়েছিলেন তিনি এই সব উপখ্যানের মধ্য দিয়ে। এই কারনে তিনি কালিদাস ভবভূতি, সেক্সপীয়ার প্রভৃতি মহান লেখকের দ্বারস্থ হয়েছিলেন। হিতোপদেশ, তোতাকাহিনী, পুরুষপরীক্ষা, বেতালপঞ্চবিংশতির গল্প বলায় সেকালের পন্ডিতেরা সব শক্তি নিয়োজিত করতেন। সাহিত্যাস্বাদের দিক থেকে এদের সঙ্গে কালিদাসাদির উপাখ্যানের তুলনাই হয়না। বিদ্যাসাগরের সৌন্দর্য-চেতনার সুস্পষ্ট নির্দেশ এখানে মিলছে। আধুনিক কালে কি ধরনের কথা সাহিত্য রচনা করা যায়, পাঠকের নব্যরুচি ও রস বোধের দাবি কি, তা নিয়ে যথার্থ ভাবনা দেখা দিয়েছে ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে। কারণ এই সময়েই ইংরেজী শিক্ষিত নতুন পাঠক ও লেখক শ্রেণীর উদ্ভব হয়েছে।

রাজা রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বাংলা গদ্যের ক্ষেত্রে যে অবদান পরবর্তীকালে বাংলা উপন্যাস রচনার পথ প্রশস্ত করেছিল সেই কৃতিত্বের দাবি হিন্দী সাহিত্যেও পড়েছিল। এই দুই গদ্য নির্মাতা শুধু বাংলা সাহিত্যে নয়, হিন্দী সাহিত্যের ক্ষেত্রেও স্মরণীয়।

রাজা রামমোহনকে হিন্দী সাহিত্যের ঐতিহাসিকেরা হিন্দী সাহিত্যিক হিসেবে সম্মান করেছেন - "সেই যুগে হিন্দী গদ্য যখন সম্পূর্ণ বিকশিত হয়ে উঠেনি, রামমোহন তখনই হিন্দী গদ্যের মূল্য স্বীকার করে তাঁর বেদান্ত বিষয়ক গ্রন্থ (বেদান্তসার, বেদান্ত গ্রন্থ ১৮১৫) হিন্দীতে অনুবাদ করে বিনামূল্যে বিতরন করেছিলেন। .....হিন্দী সাহিত্যক্ষেত্রে রামমোহনের স্থান নির্দেশ করে পন্ডিত রামচন্দ্র শুক্ল লিখেছেন : "রাজা সাহেবের ভাষায় এক আধ জায়গায় কিছু বাঙ্গালীয়ানা নিশ্চই পাওয়া যায়, কিন্তু তার রূপ অধিকাংশ সেই ধরনের যা শাস্ত্রজ্ঞ বিদ্বানদের ভাষায় দেখা যায়।" .....কিন্তু ভাষা বিচারে এই বাঙ্গালীয়ানাটুকুও ডক্টর হাজারী প্রসাদ দ্বিবেদী মানতে চাননি। 'রাম মোহন শতবার্ষিকী' গ্রন্থে(১৯৩৩ খ্রী:) হিন্দী ভাষায় 'রামমোহন' প্রবন্ধে দ্বিবেদী-জী লিখেছেন যে রামমোহনের ভাষা 'বাঙ্গালী হিন্দী নয়, তাঁর ভাষা 'ব্যাকরণ হিসাবে খুব বিশুদ্ধ' বানানের দিকে দৃষ্টি আকর্ষন করে দ্বিবেদীজী বলেছেন যে হিন্দীতে 'করণে' 'রানী' দন্ত্য ন হলেও রামমোহন

মূর্ধন্য 'ণ' ব্যবহার করেছেন বাঙালীয়ানা বশতঃ নয় 'পত্রবিধান' অনুসারে। লেখনক্রম হিসেবে আলোচনা করে দ্বিবেদী-জী দেখিয়েছেন রামমোহনের স্থান কোথায়। হিন্দী গদ্য লেখকদের মধ্যে সদাসুখলাল (ফারসী লিপি), নল্লুজীলাল(১৮০১, নাগরী লিপি) রামমোহনের পূর্ববর্তী। সদল মিশ্র(১৮০১ নাগরী লিপি), ইনশা অল্লা(১৮০১ ? ফারসী লিপি)। রাম-মোহনের পূর্বে হিন্দী গদ্য পাওয়া গেলেও উচ্ছসিত প্রশংসা করে দ্বিবেদীজী বলেছেন যে, রামমোহনের পূর্ববর্তী ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের লেখকেরা চাকুরীর দায়ে হিন্দী গদ্য লিখেছেন। এ বিষয়ে রামমোহন হিন্দীর "সেচ্ছাপ্রবৃত্ত লেখক"।[৪]

হিন্দী-প্রেম ও হিন্দীজ্ঞানে বিদ্যাসাগরের কীর্তিও স্মরণীয়। ১৮৪১ সালে বিদ্যাসাগর ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে বাংলা বিভাগের সেরেস্তাদার বা প্রথম পণ্ডিতের পদ পেয়েছিলেন। ১৮৪৭ সালে হিন্দী 'বৈতাল পচ্চীসী অবলম্বনে রচিত তাঁর " বেতাল পঞ্চবিংশতি" গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের নির্দেশে। বিদ্যাসাগরের দুই জীবনীকার বিহারীলাল সরকার ও চন্ডীচরণ বন্দোপাধ্যায় ....." এঁদের জীবনী থেকে জানা যায় বিদ্যাসাগর ১৮১১-১৮৪৭ এর মধ্যে " বাসুদেব চরিত রচনা করেন" "[৫]। ভারতেন্দু হরিশচন্দ্রের পত্রিকা 'কবিবচনসুধা' বিদ্যাসাগরের লেখা লাভ করত।

রামমোহন, বিদ্যাসাগরের পর কেশবচন্দ্র সেন, রাজনারায়ন বসু, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, বাবু নবীনচন্দ্র রায় বাংলাভাষা ও সাহিত্যের উৎকর্ষ বিধানের সাথে সাথে হিন্দীর প্রসার ও প্রতিষ্ঠায় অংশ নিয়েছিলেন বাংলা ও হিন্দীভাষার যোগাযোগ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছিল, এঁদের সহযোগে।

বিদ্যাসাগর 'বেতালপঞ্চবিংশতি', 'শকুন্তলা' লিখে গদ্যআখ্যায়িকার যে পথ নির্মাণ করলেন তাতে বাংলা উপন্যাসের প্রবেশের পথ খুলে গেল। ১৮৫৮ খ্রীষ্টে প্যারীচাঁদ মিত্রের 'আলালের ঘরে দুলাল' বাংলা গদ্যরীতিতে ও রূপে নতুনত্বের প্রচেষ্টা জানাল। ধীরে ধীরে বাংলা উপন্যাসের এই প্রবাহ বংকিমচন্দ্রের দুর্গেশনন্দিনীর প্রকাশ হতে(১৮৬৫) প্রকাশ ভঙ্গীর বিকাশে এবং সাহিত্য কল্পনায় যে কোন শ্রেষ্ঠ আধুনিক সাহিত্যের প্রতিযোগিতার সামর্থ অর্জন করল।

'সাহিত্যিক গদ্য' যা উপন্যাসের পক্ষে অপরিহার্য, হিন্দী গদ্যচর্চার সূচনা থেকে বাংলা গদ্যের মতই হিন্দী লেখক সম্প্রদায়ের ভাষারীতির আদর্শ নিয়ে প্রশ্ন দেখা দিল। সাহিত্যের বাহন হবে কোণ রীতি ? বাংলা গদ্যে বংকিম এবং কাব্যে মধুসূদন যে নবযুগের সূচনা করেছিলেন তা হিন্দীসাহিত্যেও নবজীবনের সঞ্চার করেছিল বাংলার সাহিত্যাদীক্ষাকে বরণ করে নিয়ে হিন্দী সাহিত্যে নবযুগের জন্মদাতা ভারতেন্দু হরিশচন্দ্র স্মরণীয় উক্তি করেছিলেন - 'আমাদের সম্পত্তিশালিনী জ্ঞানবৃদ্ধা বড় বোন বাংলা ভাষার অক্ষয় রত্ন-ভান্ডারের সহায়তায় হিন্দীভাষা নিজের প্রভূত উন্নতি সাধন করুক"। (অপণী সম্পত্তিশালিনী জ্ঞানবৃদ্ধা বড়ী বহন বঙ্গভাষাকে অক্ষয় রত্ন ভান্ডার কী সহায়তা সে হিন্দীভাষা বড়ী উন্নতি করে)। ভারতেন্দু হরিশ চন্দ্র বিরাট বহুমুখী প্রতিভা নিয়ে আবির্ভূত হন, হিন্দী গদ্যের রূপ স্থির করবার জন্য অসাধারন পরিশ্রম করেন। হিন্দী সাহিত্যে আধুনিকতার অগ্রদূত ভারতেন্দু হরিশচন্দ্র (১৮৫০-১৮৮৫) উনবিংশ শতকের সপ্তম ও অষ্টম দশকে আধুনিক বাংলাসাহিত্যের সঙ্গে হিন্দী সাহিত্যের মিলনের যে সেতুপথ নির্মাণ করেছিলেন তার সুফল কবিতা ও নাটকের মত উপন্যাসের ক্ষেত্রেও দেখা দিতে বিলম্ব হল না।' 'ভারতেন্দু হরিশচন্দ্রকে কেন্দ্র করে যে সাহিত্যিক গোষ্ঠী গড়ে উঠেছিল তার অধিকাংশ সদস্যই বাংলাভাষা ও সাহিত্যের সঙ্গে ঘনিষ্টভাবে পরিচিত ছিলেন।"[৬]

" বাংলা থেকে উপন্যাস শব্দটি প্রতিবেশী ভাষা হিন্দীতে গৃহীত হয়। হিন্দীতে এর সর্বপ্রথম ব্যবহার দেখা যায় ১৮৭১ সালে 'মনোহর উপন্যাস' নামক বই-এর শীর্ষে। ..... ভারতেন্দু হরিশচন্দ্র বংকিমের 'দুর্গেশনন্দিনী' নিজের তত্ত্বাবধানে হিন্দীতে অনুবাদ করান এবং নিজের সম্পাদিত 'কবিবচনসুধা' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করান। হিন্দীর জনপ্রিয় লেখক কিশোরীলাল গোস্বামী তাঁর প্রথম উপন্যাস 'সুখশর্বরী'র প্রথম পাতায় লেখেন "বাংলা উপন্যাস অবলম্বনে বিশুদ্ধ হিন্দীতে রচিত" যদিও বাংলা উপন্যাসের নাম করা হয়নি, তবু পড়লে বোঝা যায় এর প্রেরণা খানিকটা 'কপালকুণ্ডলা' থেকে এসেছে। বাংলা ভাষা ও বাঙালী সংস্কৃতির প্রতি আকর্ষণ সে যুগে অন্যান্য ভাষার উপন্যাসে নানাভাবে প্রকট।"[৭]

বাংলা হিন্দীর মেলবন্ধনে ভারতেন্দু হরিশচন্দ্রের ভূমিকা ছিল অসাধারণ। ১৮৬৮ তে যতীন্দ্র মোহন ঠাকুরের 'বিদ্যাসুন্দর' নাটক তিনি অনুবাদ করেন। এই নাটকেই তিনি মার্জিত হিন্দী গদ্যের প্রাক্‌ভাস দিলেন যা পরবর্তীকালে আরো বিকশিত হয়ে দেখা দিল।

১৮৫০ এ বেনারসের এক ধনী পরিবারে হরিশচন্দ্রের জন্ম। বেনারস সেকালে কেবল হিন্দুদের তীর্থক্ষেত্র ছিল না, হিন্দী লেখকদেরও তীর্থক্ষেত্র ছিল। ভারতীয় সংস্কৃতির অন্যতম প্রাণকেন্দ্র ছিল এই স্থানটি। বাংলাদেশ ও অন্যান্য প্রান্তের অধিবাসীরা এখানে তীর্থ করতে যেতেন অনেকে স্থায়ীভাবে বসবাস করতেন। সেকালে রাজেন্দ্র লাল মিত্র, পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রমুখ বরেণ্য বাঙালীরা কাশী গেলে হরিশচন্দ্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেন। সাহিত্য - সংগীত-শিল্প-পুরাতত্ত্ব ও শিক্ষার জন্য হরিশচন্দ্র অকৃপন হস্তে অর্থব্যয় করতেন। ..... স্ত্রী শিক্ষায় উৎসাহ দেবার জন্য হরিশচন্দ্র কলকাতার বেথুন স্কুলের ও নদীয়া জেলার কৃতী ছাত্রীদের বেনারসী শাড়ী উপহার দিয়েছিলেন। ....." তাঁর কাছ থেকে পুঁথি ও টীকা ব্যবহারের জন্যে নিয়ে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র সংস্কৃত-গ্রন্থ সম্পাদনা করেন ও মুক্তকণ্ঠে জ্ঞানীপ্রবর হরিশচন্দ্রের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। হরিশচন্দ্রের সংগৃহীত একটি দুষ্প্রাপ্য ভাগবত-পুঁথি ডক্টর রাজেন্দ্রলাল মিত্র চেয়ে পাঠান এশিয়াটিক সোসাইটিতে প্রদর্শনের জন্য, এ সম্পর্কে তিনি প্রবন্ধ লিখে প্রমাণ করতে চান যে ভাগবত বোপদেবের রচনা নয় । ডক্টর মিত্রের সঙ্গে হরিশ-চন্দ্রের সাক্ষাৎকার ও পত্র-বিনিময় হত। রাজেন্দ্র লাল হরিশচন্দ্রকে 'রাইটিং মেশিন' বলতেন .....হরিশচন্দ্রের অন্যান্য বান্ধবদের মধ্যে ছিলেন শম্ভুচরণ মুখার্জী, কৃষ্ণদাস পাল, ভূদেব মুখার্জী, কেশব সেন ইত্যাদি।" [৮]

হরিশচন্দ্রের বিপুল রচনা সম্ভারে মূল হলেও বাংলা রচনা ছিল। হরিশচন্দ্রের মৌলিক প্রহসনে 'বংগালীবাবু'র চরিত্র থাকত। 'বৈদিকী হিংসা, হিংসা ন ভবতি' এই প্রহসনে বিধবা বিবাহের প্রচারক এক বংগালী বাবুর চরিত্র লেখা হয়। আর এক বৈষ্ণব বংগালী বাবুর সাথে এক বেদান্তীর তর্ক হয়। বংগালীবাবু এশিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় প্রকাশিত ডক্টর রাজেন্দ্রলাল মিত্র'র লেখা শাস্ত্র হিসাবে উদ্ধৃত করে। বন্ধ হলেও বিদ্যাসা-গরের মত ও ব্যাঙ্গের লক্ষ্য হয়েছিল এই প্রহসনে।

হরিশচন্দ্রের আর একটি প্রহসন 'ভারতদুর্দশা'। এটি রূপক। একটি দৃশ্যে ভারতের দুর্দৈব দূর করবার জন্য কমিটি তৈরীর কথা আছে। ঐ কমিটিতে এক বাংগালীবাবু'ও ছিলেন। হরিশ চন্দ্রের জনপ্রিয় প্রহসন 'অন্ধের নগরী' বাংলায় একাধিকবার অনুদিত ও অভিনীত হয়েছে।

বঙ্গ বিদুষী মল্লিকার সঙ্গে ভারতেন্দুর নিবিড় সম্পর্ক হিন্দী বাংলা সাহিত্যের সমন্বয়ের ইতিহাসে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরনীয় .....১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে হরিশচন্দ্রের সঙ্গে মল্লিকার পরিচয় হয়। বিদুষী মল্লিকার বাংলা ও হিন্দী ভাষায় দক্ষতা ছিল। তিনি ছিলেন মহিলা কবি। সাহিত্যিক ও অনুবাদক। মল্লিকা একজন বঙ্গদেশীয় কুলবতী স্ত্রী ছিলেন। তিনি বিধবা কি স্বামী পরিত্যক্তা ছিলেন জানা যায় না। .....হরিশচন্দ্র বৈষ্ণব ছিলেন, সম্ভবতঃ বৈষ্ণবমতে তিনি মল্লিকাকে গ্রহন করেছিলেন এবং তাঁর আমরন রক্ষনাবেক্ষন করেছিলেন। হরিশচন্দ্রের এক জীবনীকার শিবনন্দন সহায় লিখেছিলেন "ওর সঙ্গে সহবাসের ফলে বাবু সাহেবের স্বকার্য সাধনেও অনেককিছু সহায়তা মিলত। বঙ্গ ভাষার গ্রন্থ পঠন পাঠনে ওর দ্বারা এর অনেককিছু কাজ চলত। ভারতেন্দুর অন্য এক জীবনীকার মদনগোপাল সন্দেহের সঙ্গে লিখেছেন মল্লিকা ছিলেন হরিশচন্দ্রের বাঙালী(দ্বিতীয়) 'শ্রী' । রায় কৃষ্ণদাস লিখেছেন, 'ভারতেন্দুজী ওকে পেয়ে জীবনে যে পূর্ণতা অনুভব করলেন, তার প্রথম অভিব্যক্তি এই ছিল যে ইং ১৮৭৩ এ 'হরিশচন্দ্র চন্দ্রিকা' নামে প্রকাশিত হল। মল্লিকা 'চন্দ্রিকা' এই ছদ্মনামে বাংলা ভাষায় কবিতা লিখতেন। এই নতুন সংখ্যা থেকে পত্রিকার বিষয়বস্তু বদলে গেল, অনেক খ্যাতনামা বাঙালী লেখকদের রচনা অনুদিত হয়ে প্রকাশিত হল। বাংলা রচনা নির্বাচন ও অনুবাদে মল্লিকা সক্রিয় ছিলেন। এক কথায় মল্লিকা ছিলেন এই পত্রিকার নেপথ্যের মূল সম্পাদিকা। হরিশচন্দ্রের নির্দেশে মল্লিকা স্বনামে কিছু বাংলা উপন্যাস হিন্দীতে অনুবাদ করেন ..... এদের মধ্যে ছিল রাধারানী, সৌন্দর্যময়ী, আর চন্দ্রপ্রভা পূর্ণপ্রকাশ। হরিশচন্দ্র নিজে রাজসিংহ অনুবাদে হাত দেন, কিন্তু শেষ করতে পারেন নি। স্বয়ং বংকিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় নিজ উপন্যাস হিন্দীতে অনুবাদের জন্য হরিশচন্দ্রকে অনুমতি দেন।"[১]

১৮৮৫ তে ভারতেন্দু ইহলোক ত্যাগ করেন। সাহিত্যের আদর্শ যে মিলন তা ভারতেন্দুর মধ্যে সারাজীবন বজায় ছিল। ভারতেন্দু হরিশচন্দ্রের সাথে বাংলা সাহিত্যের যোগাযোগ, হিন্দী

ও বাংলা উভয়ভাষার ক্ষেত্রেই শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়। প্রতিবেশী রাজ্যের দুই পৃথক ভাষার আদান-প্রদান ভারতীয় সাহিত্যের এক বিশিষ্ট দিক।

ফলবান গতিশীল সাহিত্যের অন্যান্য লক্ষণের সঙ্গে একটি বিশেষ লক্ষণ তার অনুবাদ ধারার অব্যাহত গতি। এখানে সে দাতা ও গ্রহীতা-দুইই। অন্যভাষা থেকে গ্রহণ করে সে নিজেকে পুষ্ট করে, এবং অন্যভাষায় স্বীয় সম্পদ দান করে সে নিজেকে প্রসারিত করে। বাংলা ও হিন্দী উভয়ভাষার সাহিত্যই এই আদান-প্রদানে পরিপুষ্ট হয়েছে, বিস্তার ও গভীরতা পেয়েছে।

ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের প্রতিষ্ঠা হতে (১৮০০ খ্রী:) ভারতেন্দুর বিদ্যাসুন্দর অনুবাদ পর্যন্ত (১৮৬৮) হিন্দী সাহিত্যের মৌলিক রচনা প্রায় অকিঞ্চিৎকর। ভারতেন্দুর পূর্বে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের ভিতরে ও বাইরে (সদাসুখলাল, লল্লুজীলাল, সদল মিশ্র) হিন্দী গদ্যরচনার প্রচেষ্টা চলছিল। কিন্তু তখনো কথাগদ্য, উপন্যাসের নতুন অঙ্গ হিন্দী সাহিত্যে আসেনি। মৌলিক উপন্যাস সৃষ্টির পূর্বে ১৮০০ সাল থেকে যখন হিন্দী গদ্যের রূপ স্থির হতে আরম্ভ হয়, তখনই সংস্কৃত, আরবী, ফারসী থেকে অনুদিত হয়ে হিন্দী কথাসাহিত্য প্রকাশিত হতে থাকে। এর মধ্যে আছে রানী কেতকী কী কাহানী, সিংহাসনবত্তিসী, বৈতালপচ্চীসী মাধবানল কামকন্দলা, শকুন্তলা, প্রেমসাগর, নাসিকেতোপাখ্যান, কিসসাতোতামযুনা, চহার দরবেশ ও কিস্সা হাতেমতাই ইত্যাদি। এই সব কথা সাহিত্যেই হিন্দী পাঠকের মনোরঞ্জন হত। ভারতেন্দু তাঁর অনুগামীদের বলেন 'বঙ্গভাষার অক্ষয় রত্ন ভান্ডারের সাহায্যে হিন্দী ভাষার উন্নতি করতে। ভারতেন্দুর অনুগামীরা এই নির্দেশ কার্যে রূপান্তরিত করেছিলেন বাংলা ভাষায় রচিত সাহিত্যের হিন্দী অনুবাদের মাধ্যমে। "যতীন্দ্র মোহন ঠাকুরের বিদ্যাসুন্দর নাটকের হিন্দী অনুবাদ (১৮৬৮) ছেড়ে দিলে বিদ্যাসাগর রচিত আখ্যানমঞ্জরী(১৮৬৩)র হিন্দী রূপান্তরই (১৮৬৮) বোধহয় হিন্দীতে অনুদিত বাংলা সাহিত্যের প্রথম গ্রন্থ। পাঁচ বছরের মধ্যে বইটির পঞ্চম সংস্করন এবং ১৮৭৯ সালে আখ্যান মঞ্জরীর দ্বিতীয় অনুবাদ দেখে মনে হয়, বইটি হিন্দী পাঠক সমাজে বিশেষ জনপ্রিয় হয়েছিল। বিদ্যাসাগরের জনপ্রিয়তার দ্বিতীয়

নিদর্শন 'সীতার বনবাস' (১৮৬০) যার প্রথম হিন্দীরূপ প্রকাশিত হয় ১৮৭৪ সালে এবং পরে আরও তিনটি স্বতন্ত্র অনুবাদের সন্ধান পাওয়া যায়। সুতরাং নিঃসংকোচে বলা যেতে পারে, হিন্দী অনুবাদের প্রথমযুগে (১৮৬৮-৮২) বিদ্যাসাগর ছিলেন সকলের অগ্রবর্তী"[১০]

ভারতেন্দু হরিশ্চন্দ্রের দৃষ্টি মূলতঃ ছিল হিন্দী প্রবন্ধ ও নাটকের দিকে নিবদ্ধ। তাঁর দৃষ্টি যখন কথা সাহিত্যের দিকে আকৃষ্ট হল তখন তিনি বাংলা উপন্যাসগুলির অনুবাদের উপর জোর দিতে থাকেন। " সে যুগে হিন্দী উপন্যাসের অভাব ছিল। হরিশচন্দ্রের প্রচেষ্টায় তাঁর অনুবর্তীরা কিছু বাংলা উপন্যাস হিন্দীতে অনুবাদ করেন, যেমন - স্বর্ণলতা, দুর্গেশ-নান্দিনী, রাধারানী ইত্যাদি। হরিশচন্দ্র নিজে রাজসিংহ অনুবাদের হাত দেন, কিন্তু শেষ করতে পারেন নি। স্বয়ং বংকিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় নিজ উপন্যাস হিন্দীতে অনুবাদের জন্য হরিশচন্দ্রকে অনুমতি দেন"।[১১]

হিন্দী উপন্যাস রচনার প্রারম্ভিক পর্বে, বাংলা উপন্যাসের হিন্দী অনুবাদ ছিল, হিন্দী উপন্যাস রচনার প্রেরণা স্বরূপ। হিন্দীতে লালা শ্রী নিবাসদাস লিখিত উপন্যাস "পরীক্ষাগুরু (১৮৮২)" কে হিন্দীর প্রথম উপন্যাস বলা যায়। কিন্তু রচনাকালের দৃষ্টিতে শ্রদ্ধারাম ফিল্লৌরী রচিত 'ভাগ্যবতী' (১৮৭৭) হিন্দী উপন্যাস সাহিত্যের প্রথম মৌলিক সৃষ্টি বলে স্বীকৃত। 'ভাগ্যবতী' 'পরীক্ষাগুরু'র আগে রচিত হয়, প্রকাশিত হয় ১৮৮২ সালে। এর পূর্ব থেকেই বাংলা উপন্যাসের হিন্দী অনুবাদ অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়েছিল। ".......
..-'ভাগ্যবতী' (১৮৭৭) কী রচনা কে পূর্ব বঙ্গলা মে সামাজিক আউর ঐতিহাসিক দোনো হী প্রকার কে অচ্ছে উপন্যাস প্রকাশিত হো চুকে থে। হিন্দী মে মৌলিক উপন্যাসো কী রচনা আরম্ভ হোনে কে পূর্ব বঙ্গলা উপন্যাসো কে অনুবাদো কো লোকপ্রিয়তা মিল চুকী থী। হিন্দীকে ভারতেন্দু যুগীন মৌলিক উপন্যাসো পর সংস্কৃত কে কথা সাহিত্য এবং পরবর্তী নাটক সাহিত্য কে প্রভাব কে সাথ হী বঙ্গলা উপন্যাসো কী ছাপ ভী লক্ষিত কী জা সকতী হ্যায়। ইসযুগকে উপন্যাস কারো মে লালা শ্রী নিবাস দাস (১৮৫১-১৮৮৭) কিশোরীলাল গোস্বামী (১৮৬৫-১৯৩২)

বালকৃষ্ণ ভট্ট (১৮৪৪-১৯১৪)। ঠাকুর জগন্মোহন সিং (১৮৫৭-১৮৯৯) রাধাকৃষ্ণ দাস (১৮৬৫-১৯০৭)। লজ্জারাম শর্মা (১৮৬৩-১৯৩১) দেবকীনন্দন খত্রী (১৮৬১-১৯১৩) আউর গোপাল রাম গহমরী (১৮৬৬-১৯৪৬) উল্লেখনীয় হ্যায়।"[১২]

হিন্দী উপন্যাসের প্রথম পর্ব অর্থাৎ প্রেমচাঁদের পূর্বের (১৮৮২-১৯১৬) অধ্যায় হিন্দী উপন্যাসের শৈশবকাল। হিন্দী উপন্যাসের এই শৈশবে রহস্য-রোমাঞ্চ এবং অদ্ভুত অকল্পনীয় ভোগ বিলাস ও চাতুর্যের লীলা খেলার চমকপ্রদ ঘটনাবহুল উপন্যাসের যে পাঠক তৈরী হয়েছিল তাদের রুচিকে উন্নত করতে এই অনুবাদ সাহিত্য প্রভূত পরিমানে সহায়তা করে। ভারতেন্দু যুগে সামাজিক - ঐতিহাসিক - তিলস্মী(যাদুকাহিনী) গোয়েন্দা কাহিনী এবং রোমান্টিক উপন্যাস রচনার সূত্রপাত হয়েছিল। এই রচনার ধারা ক্রমশঃ অগ্রবর্তী হয়ে দ্বিবেদীযুগে আরো অধিক বিকশিত হয়েছিল। সামাজিক উপন্যাসের মধ্যে 'ভাগ্যবতী' ও পরীক্ষা গুরু ছাড়া বালকৃষ্ণ ভট্টর 'নূতন ব্রহ্মচারী'(১৮৮৬) 'সও অজান এক সুজান' (১৮৯২) রাধাকৃষ্ণদাসের 'নিঃসহায় হিন্দু'(১৮৯০) লজ্জারাম শর্মার 'ধূর্ত রসিকলাল'(১৮৯০) ও 'স্বতন্ত্র রমা আউর পরতন্ত্র লক্ষ্মী'(১৮৯৯) কিশোরী লাল গোস্বামীর 'ত্রিবেনী বা সৌভাগ্য শ্রেনী'(১৮৯০) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই সব উপন্যাসের লক্ষ্য ছিল - সমাজের কুকীর্তি কে সামনে এনে তার বিরোধিতা করা এবং আদর্শ পরিবার ও সমাজ রচনা করা। কিশোরী লাল গোস্বামী ছিলেন এই ধারার জনপ্রিয় লেখক।

এই সময় হিন্দীতে সব থেকে জনপ্রিয় ছিল তিলস্মী বা যাদু উপন্যাস। দেবকীনন্দন খত্রীর 'চন্দ্রকান্তা' 'চন্দ্রকান্তা সন্ততি' 'নরেন্দ্র মোহিনী' 'বীরেন্দ্রবীর' 'কুসুমকুমারী', এই সব জনপ্রিয় উপন্যাসগুলির অন্যতম। এই সব উপন্যাসে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই কোনো সুন্দরী রাজকুমারী কোন যাদু প্রাসাদে বন্দী হয়ে যেত। এই রাজকুমারীকে তার প্রেমিক রাজকুমারের উদ্ধারের কাহিনী নিয়েই এই সব উপন্যাসের বেশীর ভাগ রচিত। কথিত আছে অন্য ভাষা-ভাষী(বিশেষ করে বাঙালী, গুজরাটি এবং মারাঠি) রসিকজনেরা এই বই পড়বার জন্য হিন্দী শিখা করেন। 'চন্দ্রকান্তা'(১৮৯১) বইটির জন্য দেবকীনন্দন খত্রী স্মরণীয় হয়ে আছেন এই

110520 ...১৫
27 SEP 1993

কারণে যে এই একটি বই দিয়ে তিনি যত পাঠক তৈরী করেছিলেন, হিন্দী সাহিত্যের আর কোনো লেখক তা পারেননি। শ্রী গোপাল রাম গহমরী হিন্দীতে রোমান্স উপন্যাসের জনক। গোপাল রাম গহমরী প্রচুর সংখ্যায় 'জাসুসী' উপন্যাস রচনা করেন।

এই সময়কার সামাজিক উপন্যাসে বিদেশী ও বিদেশী সভ্যতার প্রতি ঘৃণা উদ্রেক করবার চেষ্টা করা হয়েছে। এরই সমান্তরালে ভারত ও ভারতমাতা এবং প্রাচীন সভ্যতার গরিমার প্রতি পাঠকবর্গের মধ্যে রুচি ও শ্রদ্ধা জাগ্রত করার প্রচুর নিদর্শন এই সময়কার সামাজিক উপন্যাসে পাওয়া যায়। বহু উপন্যাসে রোমান্টিক ভাবধারার ও নিদর্শন দেখতে পাওয়া যায়। সে সময়ে হিন্দী উপন্যাস জগতে এমন কোনো প্রতিভাবান ঔপন্যাসিক ছিলেন না যিনি যুগের রুচিকে পরিবর্তিত করবার সামর্থ্য রাখতেন অথবা ঘটনাবহুল কথা সাহিত্যকে মনস্তাত্ত্বিক ও বাস্তববাদী ভিত্তির উপর উপস্থাপিত করবার ক্ষমতা দেখাতেন।

আলোচ্যযুগে সামাজিক উপন্যাসের তুলনায় ঐতিহাসিক উপন্যাস কম লেখা হয়েছিল। ঐতিহাসিক উপন্যাসের ক্ষেত্রেও কিশোরীলাল গোস্বামীর নাম উল্লেখযোগ্য - "Historical Novels were also written in the Pre-Prem Chand era. Kishorilal Goswami is the first historical Novelist of Hindi literature. He was influenced by Bankim Chandra Chatterjee."[13]

কিন্তু কিশোরীলাল গোস্বামীর ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলিকে অনেক হিন্দীসাহিত্য সমালোচক পুরোপুরি ঐতিহাসিক মর্য্যাদা দিতে সম্মত ছিলেন না। তাঁদের আদর্শছিল বংকিমচন্দ্র লিখিত উপন্যাসগুলি, যা বাংলা থেকে সেই যুগে হিন্দীতে অনুদিত হয়েছিল - "সামাজিক উপন্যাসো কী তুলনামে আলোচ্য যুগ মে ঐতিহাসিক উপন্যাস কম লিখ গয়ে। ইস ক্ষেত্রমে কিশোরীলাল গোস্বামী কা নাম হী উল্লেখযোগ্য হ্যায়, কিন্তু উনকে 'লবঙ্গলতা' (১৮৯০) উপন্যাস কো ঐতিহাসিক উপন্যাস কী মর্য্যাদা দেনা উচিৎ নহী হ্যায়। বস্তুতঃ ইস যুগ মে ঐতিহাসিক উপন্যাসো কী আলংখা কী পূর্তি বংকিমকে ঐতিহাসিক উপন্যাসো কে অনুবাদ সে হুই।"[১৪]

হিন্দীতে বংকিম অনুবাদের পথিকৃৎ গদাধর সিংহ (১৮৪৮-১৮), ভারতেন্দু তাঁর সম্পাদিত সাময়িকপত্র 'কবিবচন সুধা'য় ধারাবাহিক ভাবে তাঁর দুর্গেশনন্দিনী'র অনুবাদ প্রকাশের বন্দোবস্ত করেন। ভারতেন্দু স্বয়ং 'রাজসিংহ' অনুবাদে হাত দিয়েছিলেন। তাঁর অকাল মৃত্যুর ন'বছর পর তা গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় (১৮৯( )। এই অনুবাদের বৈশিষ্ট্য প্রতিটি পরিচ্ছেদের শীর্ষে ভারতেন্দুর রচিত প্রসঙ্গ উপযোগী কাব্যাংশের উদ্ধৃতি। গদাধর সিংহের 'দুর্গেশনন্দিনী'র হিন্দী অনুবাদের কয়েকটি সংস্করন প্রকাশিত হয়েছিল, এতে মনে হয় বইটি বাংলার মত হিন্দী সাহিত্য জগতেও সমাদর লাভ করেছিল। ১৯০০ সাল নাগাদ বংকিমের প্রায় সমস্ত উপন্যাসেরই হিন্দীতে অনুবাদ হয়। কোনো কোনো বছর একই উপন্যাসের একাধিক অনুবাদ প্রকাশিত হয়। বংকিমের 'আনন্দমঠ' উপন্যাসের অনুবাদ স্বতন্ত্র মর্য্যাদায় প্রতিষ্ঠিত। ১৯০৬ সালে হিন্দী আনন্দমঠের যে সন্ধান পাওয়া যায় তার অনুবাদক কমলানন্দ সিংহ। ১৯২২ সনে 'আনন্দমঠ' অনুবাদ করেন ঈশ্বরী প্রসাদ শর্মা। হিন্দীভাষীদের মধ্যে ঈশ্বরী প্রসাদ শর্মার 'আনন্দমঠ' দীর্ঘকাল জনপ্রিয় হয়েছিল তার প্রমান ১৯৪৫ সালের সপ্তম সংস্করন। সত্তরের দশকে আবার এই বইটির অনুবাদ করেন, ওঙ্কার শারদ, হংস কুমার তেওয়ারী প্রমুখরা।

উত্তর ভারতের হিন্দীর উপর বংকিমের ভাষা ও রচনারীতির প্রভাব পড়েছিল। হিন্দীকে যে আজ অত্যাধিক সংস্কৃতময়তার জন্য সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়, তার অন্যতম কারন বংকিমচন্দ্রের সাহিত্যিক ভাষা। উনিশ শতকে হিন্দী যখন সাহিত্যিক ভাষারূপে প্রতিষ্ঠিত হল, তখন বংকিমচন্দ্রের গ্রন্থাবলী থেকে অনেক নতুন নতুন শব্দ হিন্দী শব্দ ভান্ডারে প্রবেশ করে। কেবল অনুবাদে নয় হিন্দী লেখকদের মৌলিক উপন্যাসেও এই জাতীয় শব্দের অনুপ্রবেশ ঘটে। শব্দগুলি ছিল শুদ্ধ সংস্কৃত শব্দ, কিন্তু এই জাতীয় শব্দ সোজা সংস্কৃত থেকে হিন্দীতে আসেনি। এসেছে বংকিমচন্দ্র ও অন্যান্য বাঙালী লেখকদের রচনা থেকে এই প্রভাবের বিরুদ্ধে হিন্দী সাহিত্যের ইতিহাসকার বলেছেন যে বঙ্গভাষা থেকে প্রসঙ্গ অনুরূপ অনেক সুন্দর ও উপযুক্ত শব্দ আসতে থাকে। বাজার প্রতি হিন্দী ভাষার ঝোঁকে অনেক পরিমার্জিত এবং সুন্দর সংস্কৃত পদবিন্যাসের যে পরম্পরা হিন্দীতে এসে গেল। ("বংগভাষা সে প্রসঙ্গ য়া স্থলকে অনুরূপ বহুত সী সুন্দর ঔর উপযুক্ত সংস্কৃত শব্দ মিলতে থে। অতঃ বংগভাষা কী ওর জো ঝুকাও

রহা উসকে প্রভাব সে বহুত হী পরিমার্জিত ওর সুন্দর সংস্কৃত পদবিন্যাস কী পরম্পরা হিন্দী মে আয়ী, ইহ স্বীকার করনা পড়তা হৈ" : রামচন্দ্র শুক্ল, হিন্দীসাহিত্য কা ইতিহাস : ১৯৪২) গ্রন্থারাম ফিল্লৌরী, লালা শ্রী নিবাস দাস, কিশোরীলাল গোস্বামী, দেবকীনন্দন খত্রী, গোপাল রাম গহমরী প্রমুখের প্রয়াসে হিন্দী উপন্যাস রচনার যে স্রোত দেখা দিয়েছিল, বংকিম প্রতিভা তাকে বেগবতী করে তোলে।

অনুবাদের মাধ্যমে বংকিম প্রতিভার পরোক্ষ সংস্পর্শে এসে অনেক হিন্দীসাহিত্যিক ই উপন্যাস রচনায় হাত দিয়েছিলেন। বংকিমযুগে ভারতীয় উপন্যাস সাহিত্যে বংকিমচন্দ্রই রাজাধিরাজ একথা পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। বাংলা সাহিত্যে বংকিমকালে বংকিমের আদর্শে বেশ কিছু কথাশিল্পী, রমেশচন্দ্র দত্ত, তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, পূর্নচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, স্বর্ণকুমারী দেবী, শিবনাথ শাস্ত্রী, দামোদর মুখোপাধ্যায় প্রমুখরা উপন্যাস রচনায় ব্রতী হয়েছিলেন। এঁদের রচনাও হিন্দী সাহিত্যে আদরণীয় হয়েছিল। এঁদের উপন্যাসের অনুবাদে - ভাবানুবাদে হিন্দী উপন্যাস জগতে বেশ প্রান চাঞ্চল্য এসেছিল।

১৮৮২তে বংকিমচন্দ্রের উপন্যাসের অনুবাদের পর কৃতী অনুবাদক গদাধর সিংহ রমেশচন্দ্র দত্ত'র উপন্যাস 'বঙ্গবিজেতা'র হিন্দী রূপান্তর প্রকাশ করেন। ১৮৮৬ সালে রমাশংকর ব্যাস অনুবাদ করলেন পূর্নচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'মধুমতী'। এর পরে বাংলা উপন্যাসের হিন্দী অনুবাদে চারদিক ছেয়ে গেল। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য মুন্সী হরিনারায়ন লালের অনুবাদ, স্বর্ণকুমারী দেবীর 'দীপনির্বান' (১৮৯১)। তারক নাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'স্বর্ণলতা' (১৮৯৩) শিবনাথ শাস্ত্রীর 'মেজবউ' (১৮৯৮) এ ছাড়াও দামোদর মুখোপাধ্যায়ের 'মৃন্ময়ী'র অনুবাদ করেছিলেন রাধাচরণ গোস্বামী।

এই সময়ের আর একটি লক্ষনীয় দিক হলো, বহু বাংলা উপন্যাসের ভাবানুবাদ যা মূল লেখকের নাম উল্লেখ ছাড়াই, ভিন্ন নামে প্রকাশিত হয়েছিলো। এ সম্পর্কে ডঃ নগেন্দ্র তাঁর

'হিন্দী সাহিত্য কা ইতিহাস' গ্রন্থে লিখেছেন - "রামকৃষ্ণ বর্মানে 'চিতোর চাতকী' কার্তিক প্রসাদ খত্রী নে 'ইলা'-'প্রমীলা' -'জয়া' তথা 'মধুমালতী' এবং গোপাল রাম গহমরী নে 'চতুরচঞ্চলা'-'ভানমতী' আউর 'নয়েবাবু' শীর্ষক অনুদিত উপন্যাসো কী রচনা কী, কিন্তু ইন কৃতিয়োঁকে বঙ্গলা-লেখকো কে নাম উল্লিখিত নহী হ্যায়। ......বস্তুতঃ উপন্যাস আউর নাটক ইন দোনো ক্ষেত্র মে বঙ্গলা-সাহিত্যকে উত্থান কে লিএ বঙ্গলা সাহিত্য কা সহারা লেনা আবশ্যক সমঝতে থে" ....[১৫]

প্রশ্ন তোলা যেতে পারে, এই সময়ে হিন্দী সাহিত্যে মৌলিক লেখকের অভাব ছিল না, তবুও হিন্দীতে বংকিমচন্দ্র, রমেশচন্দ্র দত্ত, দামোদর মুখোপাধ্যায়, স্বর্ণকুমারী দেবী, তারক নাথ গঙ্গোপাধ্যায় হারানচন্দ্র রক্ষিত, চন্ডীচরণ সেন, শরৎচন্দ্র প্রমুখ বাঙালি গ্রন্থকারদের উপন্যাসের অনুবাদের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিল কেন ? ১৮৮২ থেকে ১৯১৫ পর্যন্ত তিন দশকেরও কিছু বেশী সময় হিন্দী উপন্যাসের আরম্ভ ও সংক্রান্তিকাল। এই সময় থেকেই ইংরাজী, বাংলা ও অন্যান্য ভারতীয় ভাষায় রচিত উপন্যাসের হিন্দী রূপান্তর প্রকাশিত হতে থাকে। লক্ষনীয় এই সময়ে হিন্দী সাহিত্যে মৌলিক উপন্যাসের চেয়ে অনুদিত উপন্যাসের সংখ্যা ছিল বেশী। সেই অনুবাদ বেশীর ভাগই বাংলা থেকে।

এই সময় থেকেই হিন্দীর বিপুল পাঠক সমাজের একাংশ বংকিম উপন্যাসের রসাস্বাদনের পর হিন্দীর ডিটেক্‌টিভ ও অদ্ভুত রসের উপন্যাস নিয়ে আর খুশী হতে পারছিলেন না। তখন হিন্দী সাহিত্যিকরা বংকিমচন্দ্র ও তাঁর সহগামী ও অনুগামীদের রচনা অনুবাদ করা শ্রেয় মনে করলেন (" অপ্রৌঢ় তিলস্মী উপন্যাসোঁ কে সামনে হিন্দী সাহিত্যিকোঁ নে শ্রেষ্ঠ প্রৌঢ় বংগলা রচনাও কা অনুবাদ করনা শ্রেয়স্কর সমঝা," হিন্দী সাহিত্য কা বৃহৎ ইতিহাস, অষ্টম ভাগ, নাগরী প্রচারিনীসভা, ১৯৭২। পৃঃ ৩১৮-৩১৯) এই সমস্ত অনুবাদ উপন্যাস পড়েই হিন্দীভাষীদের মনে এই ধরনের মৌলিক উপন্যাস পড়া ও লেখার আগ্রহ জন্মে। সেই আগ্রহ মেটাবার জন্য প্রতিষ্ঠিত লেখকরাও অনুবাদ কর্মে আত্মনিয়োগ করেন। লক্ষনীয় বংকিম-এর অনুবাদক মৌলিক উপন্যাসের রচয়িতা যেখানে, সেখানে তাঁর পরবর্তী রচনায় বংকিমচন্দ্রের প্রভাবের মাত্রা বেশী। সাহিত্যিক দৃষ্টিতে যিনি হিন্দী ভাষার প্রথম এবং প্রাক্ - প্রেমচন্দ্র পর্বের শ্রেষ্ঠ উপন্যাসকার

সেই কিশোরীলাল গোস্বামী 'লবঙ্গলতা' (১৮৯০) 'হৃদয়হারিণী' (১৮৯০) প্রভৃতি উপন্যাস বংকিমী ধাঁচে লিখতে চেষ্টা করেছেন। এই নতুন ধরনের উপন্যাস প্রচলিত 'তিলস্মী' উপন্যাসের রঙ্ ফিকে করে দেয়, এবং হিন্দী সাহিত্যকে অতিপ্রাকৃত, অতিরঞ্জিত ও ঘটনা-বহুলের উপন্যাসের মোহজাল থেকে মুক্ত করে প্রেমচন্দ্রের আবির্ভাবের পথ সুগম করে তোলে।

বংকিমচন্দ্রের পর রবীন্দ্রনাথের হাতেই বাংলা উপন্যাসের পূর্ণবিকাশ ঘটে। বংকিম-চন্দ্রের মৃত্যুর পর (২৬শে চৈত্র, ১৩০০ সাল) সাত বছর পর রবীন্দ্রনাথের 'চোখের বালি'র প্রকাশ। 'দুর্গেশনন্দিনী'র মত 'চোখেরবালি'ও যুগ পরিবর্তনের দাবীদার। কিন্তু হিন্দী উপন্যাসের ক্ষেত্রে এই যুগ পরিবর্তনের প্রভাব ততটা মুদ্রিত হতে পারেনি। রবীন্দ্র নাথের ভাব ভাষা ছন্দকে আদর্শকরে হিন্দীকাব্য সাহিত্যে যে বিপুল আলোড়ন এসেছিল বিশেষ করে 'ছায়াবাদী' কবি গোষ্ঠীর মধ্যে, তার তুলনায় হিন্দীকথা সাহিত্য তথা উপন্যাসে প্রভাব অনেক কম। রবীন্দ্রনাথের সমগ্র উপন্যাস হিন্দীতে অনূদিত ও প্রকাশিত হয়েছে। হিন্দীসাহিত্যের বিষয়বস্তু ও প্রকাশ ভঙ্গীতে রবীন্দ্র সাহিত্যের অনুবাদ ধারা নূতন জীবন চেতনা আনয়নে সহায়ক হয়েছিল।

বংকিমচন্দ্র - রমেশচন্দ্র - রবীন্দ্রনাথ এঁদের উপন্যাসের থেকেও, বাংলা সাহিত্যের অপরাজেয় কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বংকিমচন্দ্রের পর সব থেকে বেশী প্রভাবিত করে-ছিলেন হিন্দী উপন্যাসকে। অনুবাদেও তিনি পূর্ববর্তীদের অতিক্রম করেছেন। হিন্দীতে শরৎ চন্দ্রের অনুবাদ বেরিয়েছে অজস্র। এক-একখানি গ্রন্থের যেমন বিভিন্ন অনুবাদ, তেমনি বিভিন্ন অনুবাদের নানা মুদ্রণ।

" হিন্দীতে শরৎচন্দ্র ও তাঁর সাহিত্য নিয়ে অন্ততঃ দশটি গ্রন্থ রচিত হয়েছে (১) শরৎচন্দ্র : লাবণ্য প্রভা রায় (১৯৫৪) (২) শরৎ কে নটীকে : মহাদেব সাহা (৩) শরৎচন্দ্র : ব্যক্তি ঔর সাহিত্যকার : মন্মথ নাথ গুপ্ত(১৯৬৩) (৪) শরৎচন্দ্র : ব্যক্তি ঔর

কলাকার : ইলাচন্দ্র যোশী (১৯৫৪) (৫) শরৎচন্দ্র চিন্তন ওয় কলা - ইন্দ্রনাথমদান(১৯৫৪) (৬) শরৎ কী সুক্তিয়া : রাম প্রকাশ জৈন (৭) শরৎ কে নারীপাত্র : রামস্বরূপ চতুর্বেদী (১৯৫৫) (৮) শরৎচন্দ্র : এক অধ্যয়ন - মন্মথনাথ গুপ্ত। (৯) শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় : ইন্দ্রনাথ মদান (১০) আওয়ারা মসীহা : বিষ্ণু প্রভাকর। (১১) শরৎ প্রতিভা - সুবোধ সেনগুপ্ত(অনুবাদ : রূপনারায়ণ পাণ্ডেয়)

" শরৎচন্দ্রের জীবন অভ্যাস-গঠন, সাহিত্য জিজ্ঞাসা, সাহিত্য সৃজন ও জীবন দর্শনের সঙ্গে গভীরভাবে পরিচিত হবার প্রবল ইচ্ছার ছাপ ছড়িয়ে রয়েছে অধিকাংশ বইয়ের পাতায়-পাতায়। শরৎচন্দ্রের প্রতি প্রবল জিজ্ঞাসা ও অদম্য কৌতূহল প্রখ্যাত সাহিত্যিক বিষ্ণু প্রভাকরকে প্রণোদিত করেছে শরৎচন্দ্রের একটি প্রামানিক জীবনী লিখতে। তাঁর পনের বছরের অক্লান্ত পরিশ্রম ও ঘনিষ্ঠ সাধনার ফসল - 'আওয়ারা মসীহা' (১৯৭৪)। বাংলাতেও বইটির দোসর নেই। গত ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বছর ধরে হিন্দীতে উপন্যাস বিষয়ে যে সব আলোচনা ও গবেষনামূলক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে, সবগুলিতেই শরৎচন্দ্রের সশ্রদ্ধ উল্লেখ এবং ঋনস্বীকার লক্ষিতব্য। যাই হোক 'শরৎবাবু' হিন্দী পাঠকদের পরম আপনজন, বংকিম-রমেশ ও রবীন্দ্রনাথের চেয়েও বেশী - তাতে সন্দেহ নেই। হিন্দী সাহিত্যে শরৎচন্দ্রের এই জনপ্রিয়তার কারণ - তিনি বিপর্যস্ত - বিধ্বস্ত মানুষের জীবনকে সমগ্রভাবে স্বীকার করার অকুতোভয় দৃষ্টি ও মানসিকতা ভাবুক হৃদয়কে সদয়চিত্তে সস্নেহে লালন করেছেন, উপন্যাসের পাত্র-পাত্রীর হৃদয়গত সমস্যার সমাধান বাইরে থেকে না চাপিয়ে তাদের মানসিক জাগরনের দ্বারা সম্ভব করতে চেয়েছেন, তিনি প্রথম ভারতীয় সাহিত্যিক যিনি নারীহৃদয়ের গভীরে প্রবেশ করে সূক্ষ্ম-স্পন্দন সূক্ষ্মতার সঙ্গে অনুধাবন করে সাহিত্যে শিল্পরূপ দিয়েছেন।" [১৬]

শরৎচন্দ্রের এই বৈশিষ্ট্যগুলি হিন্দী পাঠকের মনকে বিস্ময়ে বিমুগ্ধ এবং আত্মীয়তায় বিনম্র করে তুলেছে সহজেই। হিন্দী উপন্যাসে এগুলি তাঁর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ দান রূপে গৃহীত একযোগে তিনি হিন্দী সাহিত্যিক ও পাঠকের মন কেড়ে নিয়েছিলেন। তাঁর সমসাময়িক হিন্দী উপন্যাসকারগন যে তাঁর উপন্যাস - শিল্প এবং মানবতাবোধ দ্বারা অনুপ্রানিত তথা উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন - একথা নিঃসংশয়ে বলা যেতে পারে।

আধুনিক ভারতীয় ভাষার উপন্যাস ও লেখক ও সমালোচকরা তাঁদের ভাষায় শরৎ-প্রভাবের অনুরাগসিক্ত স্বীকৃতি জানিয়েছেন। সাহিত্য আকাদেমী আয়োজিত সর্বভারতীয় শরৎচন্দ্র সেমিনার (কলকাতায় অনুষ্ঠিত, ২৭-২৮ জানুয়ারী, ১৯৭৬)। এই সেমিনারে বিভিন্ন প্রদেশের উপন্যাস লেখক ও সমালোচক নিজ নিজ ভাষায় লিখিত কথাসাহিত্যে শরৎ-প্রভাব স্বীকার করেছেন। এঁদের মধ্যে হিন্দী উপন্যাস লেখক ও সমালোচক ছিলেন - বিষ্ণু প্রভাকর, শান্তিপ্রিয় দ্বিবেদী, শিবধন সিং চৌহান, রামস্বরূপ চতুর্বেদী, ইলাচন্দ্র যোশী, জ্ঞানেন্দ্রকুমার, ইন্দর নাথ মদান, মন্মথনাথ গুপ্ত, ভগবতী প্রসাদ বাজপাই, চতুরসেন শাস্ত্রী, বিশম্ভর নাথ শর্মা কৌশিক, কমলাকান্তভর্মা, অজ্ঞেয়, নলিনী বিনোচাঁদ শর্মা প্রমুখরা। এঁদের সানুরাগ স্বীকৃতি থেকে বোঝা যায়, শরৎচন্দ্রের কাছে হিন্দী উপন্যাসের ঋন কতটা। এই সেমিনারে পঠিত বিষ্ণু প্রভাকরের প্রবন্ধের সামান্য অংশ উদ্ধৃত করা হল -

....."The spirit of revolt and experimentation, the revolt against every type of injustice whether in marriage system or anywhere else in social relations that pervades and permeats Sarat's whole literature is still relevant and will ever remain relevant. Can Sarat, who loved the down trodden sodeeply that no ambition on earth could defect him from this path of love be ever outdated ?

To sum up, this much has to be acknowledge that Hindi fiction has been profoundly influenced and inspired by Sarat both directly and indirectly. His influence has been rather more effective and wider in a subtle way. There was a time when his characters like Devdas, Parvati, Srikant and Savitri were superb models with Hindi writers .....Hindi fiction shall never be able forget him (The influence of Sarat, over Hindi literature : Vishnu Prabhakar)."[17]

শরৎচন্দ্রের মত হিন্দী উপন্যাস সাহিত্যকে এত আন্দোলিত আর কেউ করতে পারেননি। বংকিমচন্দ্রের যুগ থেকে শরৎচন্দ্রের সময় পর্যন্ত বাংলা উপন্যাসের হিন্দী অনুবাদের যে ধারা বইছিল, তা শরৎচন্দ্রের সাথেই শেষ হল বলা চলে। প্রেমচন্দের আবির্ভাবের পর বাংলা উপন্যাসের হিন্দী অনুবাদ, হিন্দী উপন্যাসের মডেল হবার জন্য আর দরকার হল না। প্রেমচন্দের মত শক্তিমান ঔপন্যাসিকের আবির্ভাবে হিন্দী উপন্যাস যেন নিজস্ব জগৎ খুঁজে পেল। প্রেমচন্দের পর জৈনেন্দ্র কুমার, যশপাল, উপেন্দ্রনাথ আসক, রামচন্দ্র তেওয়ারী, ইলাচাঁদ যোশী, অজ্ঞেয় প্রভৃতি বিশিষ্ট কথা সাহিত্যিকরা হিন্দী উপন্যাসকে বিশিষ্ট স্থানে পৌঁছে দিলেন। এঁরা হিন্দী উপন্যাস সাহিত্যে নতুন মহিমা স্থাপন করলেন যাতে করে হিন্দী উপন্যাস সৃষ্টির প্রয়োজনে বাংলা উপন্যাস অনুবাদ-ভাবানুবাদের প্রয়োজন রইল না। অনুবাদ এরপর থেকে হল দুই ভাষা-ভাষীর ভাব বিনিময়ের মাধ্যম। মূল বাংলা সাহিত্য পড়তে পারেন এবং বুঝতে পারেন এমন হিন্দীভাষী পাঠকের সংখ্যা কম নয়। খ্যাত নামা হিন্দী সাহিত্যিকদের মধ্যে অনেকেই এবং তরুনদের অনেকেই বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সঙ্গে সুপরিচিত। অপরদিকে হিন্দীভাষী এলাকায় বসবাসকারী বাঙালী ছাড়াও হিন্দীভাষার জনপ্রিয়তা পশ্চিমবঙ্গেও বাড়ছে। এর ফলে এই দুই ভাষায় রচিত উপন্যাসের সাথে পাঠকদের নৈকট্য বাড়ছে। অনুবাদ ও মূলরচনা পাঠে আগ্রহের সঞ্চার হচ্ছে। এর ফলে আংশিকভাবে হলেও সর্বভারতীয় সাংস্কৃতিক অখন্ডতা ও হিন্দী ও বাংলা সাহিত্যের যোগাযোগআরো সুদৃঢ় হচ্ছে।

বাংলা ও হিন্দী উপন্যাসের পারস্পরিক সম্বন্ধের আর একটি গুরুত্বপূর্ন দিক পত্র পত্রিকার যোগাযোগ। ভারতেন্দু তাঁর 'কবিবচনসুধায়' (১৮৬৭) দুর্গেশনন্দিনীর অনুবাদ ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশের বন্দোবস্ত করে পারস্পরিক ভাব বিনিময়ের এক ঐতিহাসিক নজির স্থাপন করেন। পূর্বভারতেন্দু যুগ থেকেই কলকাতা থেকে প্রকাশিত হিন্দীপত্র-পত্রিকা উপন্যাস সৃষ্টির বাতাবরণ তৈরী করেছে। হিন্দীর প্রথম দিককার বহু সাময়িক পত্র, সংবাদপত্র কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়েছে। এই সব সাময়িক পত্র সুধ্যমান পাঠক-সমাজের মনে সমসাময়িক মানুষ ও জীবন সম্পর্কিত বাস্তব চেতনা সম্পর্কে আগ্রহী করে তুলেছিল। কলকাতা থেকে প্রকাশিত হিন্দী

সাময়িক-সংবাদপত্রগুলি, বাংলা সংবাদ-সাময়িকপত্রের আদর্শেই রচিত হত। সমসাময়িক মানুষের পরিচয়কে সাহিত্যের বিষয় করে উপন্যাস রচনার প্রয়াসকে আনুকূল্য দিয়েছে। বাংলা সংবাদ-সাময়িক পত্র, হিন্দী সংবাদ-সাময়িক পত্রের কাছে নজির স্থাপনের ফলে, পাশাপাশি হিন্দী সংবাদ-সাময়িক পত্রেও এই প্রয়াস লক্ষিত হল। ফলে অনুবাদাশ্রয়ী নভেল রচনার পাশাপাশি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার অবলম্বনে কাহিনী রচনার বিক্ষিপ্ত প্রয়াস দেখা দিল, ধীরে ধীরে যার সার্থকতর প্রকাশ উপন্যাস।

"হিন্দী সাহিত্যের ক্ষেত্রে ভারতেন্দু হরিশচন্দ্রের আবির্ভাব(১৮৫৭) এবং 'সরস্বতী' পত্রিকার প্রথম বৎসরকে (১৮৯৯-১৯০০) দুটি যুগান্তকারী ঘটনা বলে গণনা করে আমরা হিন্দীর সমাচার - সাময়িক সাহিত্যকে মোটামুটি চারভাগে ভাগ করতে পারি।"[১৮]

(ক) পূর্ব ভারতেন্দু যুগ (১৮২৬ - ১৮৫৭)
(খ) ভারতেন্দু-বালমুকুন্দ যুগ (১৮৫৭ - ১৯০০)
(গ)'সরস্বতী'-দ্বিবেদী যুগ (১৯০০-১৯১৮)
(ঘ) যুদ্ধোত্তর যুগ (১৯১৮ -)

(ক) পূর্বভারতেন্দু যুগে (১৮২৬-১৮৫৭) কলকাতা থেকে প্রকাশিত হিন্দী পত্রিকা :-

(১) উদন্ত মার্ত্তন্ড - ১৮২৬
(২) বঙ্গদূত - ১৮২৯
(৩) প্রজামিত্র - ১৮৩৪
(৪) মার্ত্তন্ড - ১৮৪৬ (হিন্দী ও অন্যান্য চারটি ভাষায়)
(৫) জ্ঞানদীপক - ১৮৪৮
(৬) সাম্যদন্ড মার্ত্তন্ড - ১৮৫০
(৭) সমাচার সুধাবর্ষন - ১৮৫৪

(খ) ভারতেন্দু-বালমুকুন্দ যুগে(১৮৫৭-১৯০০) কলকাতা থেকে প্রকাশিত হিন্দী পত্রিকা :

" এই সময়ে বা এরই কাছাকাছি সময়ে কোলকাতা কেন্দ্র হতে বাংলা পত্রিকার আদর্শে যে-কয়টি হিন্দী পত্রিকা বেরোন তার মধ্যে 'ভারতমিত্র'(১৮৭৭) 'উচিতবক্তা'(১৮৭৮)

'সার সুধানিধি(১৮৭৮) বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বাঙালী শ্রী কৃষ্ণ প্রসন্ন সেনের সম্পাদনায় দোভাষী (ব্রাংলা ও হিন্দী) 'ধর্মপ্রচারক'(১৮৭৮) পত্রিকা বেরোল। ..... কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'হিন্দীবঙ্গবাসী'(১৮৯০) বেরোবার সঙ্গে সঙ্গে তুমুল আন্দোলন পড়ে গেল।"[১১]

কলকাতা থেকে প্রকাশিত 'উদন্ত মার্ত্তণ্ড'(১৮২৬) হিন্দীর প্রথম সংবাদপত্র হিসেবে স্বীকৃত। 'বাংলা সাময়িক-পত্র (১৮১৮-১৮৬৮)' গ্রন্থের প্রনেতা ব্রজেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় অন্বেষন করে এ তথ্য প্রকাশ করেন। তিনি এই গ্রন্থের একটি পরিচ্ছেদে (৬ষ্ঠ পৃ:-৭৩) কলকাতা থেকে প্রকাশিত অন্যান্য দেশীয় ভাষার সংবাদ পত্র(১৮২২-১৮৩৫) সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। 'উদন্ত মার্ত্তণ্ড' ছিল সাপ্তাহিক। শ্যামসুন্দর সেন দ্বারা সম্পাদিত 'সমাচার সুধা-বর্ষন'ই হিন্দী ভাষায় প্রকাশিত প্রথম দৈনিক সংবাদ পত্র। ব্রজেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এ সম্পর্কে লিখেছেন - "প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা প্রয়োজন, হিন্দী ভাষায় প্রকাশিত প্রথম দৈনিক সংবাদ পত্র -'সমাচার সুধাবর্ষন'। ইহা ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসের কলিকাতা বড় বাজার হইতে শ্যামসুন্দর সেনের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। 'সমাচার সুধাবর্ষন' দ্বিভাষিক (বাংলা ও নাগরী) পত্র ছিল।"[২০]

বাবু বালমুকুন্দ গুপ্ত 'গুপ্তনিবন্ধাবলী' তে ও বাবু রাধাকৃষ্ণদাস "হিন্দীকে সাময়িক পত্রোঁ কা ইতিহাস'-এ 'বনারস অখবার'(১৮৪৪) কে প্রথম হিন্দীর সংবাদ পত্র হিসেবে অভিহিত করেছিলেন। পরবর্ত্তীকালে ব্রজেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের তৎপরতায় তা সংশোধিত হয়। এরজন্য তাঁর সংশোধন কে সম্বর্ধনা জানিয়ে 'হিন্দী কী পত্র পত্রিকা এঁ'' গ্রন্থের সম্পাদকেরা লেখেন -"বস্তুতঃ হিন্দী কা পহলা পত্র 'বনারস অখবার' নহী থা, পহলা পত্র থা 'উদন্ত মার্ত্তণ্ড' জো নাগরী অক্ষরোঁ মেঁ মুদ্রিত হোকর সন ১৮২৬ কী ৩০ মৈ কো কলকত্তে সে লহলে-পহল প্রকাশিত হুয়া থা। 'উদন্ত মার্ত্তণ্ড' হী হিন্দী কা সবসে পহলা পত্র, ইস অন্বেষন কা শ্রেয় 'মডার্ণ রিভিউ'কে সহকারী সম্পাদক শ্রী ব্রজেন্দ্র নাথ বনর্জী কো হৈ।"[২১]

(গ) 'সরস্বতী' - দ্বিবেদীযুগ (১৯০০-১৯১৮)

১৯০০ খৃষ্টাব্দে এলাহাবাদ থেকে প্রকাশিত 'সরস্বতী' পত্রিকা হিন্দী-বাংলার সখ্যকে আরো দৃঢ় করেছিল। "পত্রিকাটির প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক মহাবীর প্রসাদ দ্বিবেদী(১৮৭০ - ১৯৩৮) তরুন সাহিত্যিকদের নিয়ে একটি সাহিত্যিক-সংঘ গড়ে তুললেন। সাহিত্য ও সাহিত্যিক সৃষ্টির ক্ষেত্রে হিন্দী 'সরস্বতী' পত্রিকার গুরুত্ব ও সার্থকতা বংকিমচন্দ্রের 'বঙ্গ-দর্শন' (১৮৭২)-এর মতো।"[২২] শোনা যায় দ্বিবেদীজী সরস্বতীকে গড়ে তুলেছিলেন রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের 'প্রবাসী'ও মডার্ণ রিভিউ'এর আদর্শে। এলাহাবাদের ইন্ডিয়ান প্রেস থেকে 'প্রবাসী' ও 'সরস্বতী' প্রকাশিত হত। এই দুই পত্রিকার ছিল আত্মিক যোগ। মহাবীর প্রসাদের সুযোগ্য সম্পাদনায় বাংলা সাহিত্যের আদর্শে 'সরস্বতী' পত্রিকার মাধ্যমে হিন্দী সাহিত্য তথা কথা সাহিত্যের আধুনিকী করণে, হিন্দী ও বাংলা এই দুই পত্রিকার সখ্য দৃষ্টান্তস্বরূপ।

(ঘ) যুথোত্তর যুগ (১৯১৮ -)

'সরস্বতী' প্রকাশের আঠাশ বছর বাদে প্রকাশিত হল 'বিশাল ভারত' (১৯২৮)। এই হিন্দী পত্রিকাটির জনপ্রিয়তার জন্য হিন্দীভাষীরা শ্রদ্ধার সঙ্গে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের অক্লান্ত পরিশ্রমের কথা স্মরণ করে থাকেন।

'বঙ্গদূত' থেকে 'বিশাল ভারত' পর্যন্ত অনেক হিন্দী পত্রিকাই বঙ্গভাষা তথা বঙ্গভাষীর সহযোগে সমৃদ্ধ হয়েছে ও সাহিত্য সৃষ্টির সহায়ক হয়েছে।

হিন্দী উপন্যাসের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য যেমন প্রেমচন্দ নির্মাণ করেন, তেমনি তাঁর সম্পাদিত 'হংস' পত্রিকা ও হিন্দী সাহিত্য জগতে নতুন পথরেখার সন্ধান দেয়। ক্রমে 'মাধুরী' 'নাগরী প্রচারিনী' 'হিন্দুস্তানী' 'সম্মেলন' প্রভৃতি পত্রিকার উদ্ভবে, বাংলা পত্র-পত্রিকার আদর্শ থেকে সরে নিজস্ব ভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর ভারতীয় উপন্যাসে বাংলার আধিপত্য এবং হিন্দী উপন্যাসের বিকাশে বাংলা উপন্যাসের যোগাযোগের সাথে তৎকালীন বাংলার রাজনৈতিক - সামাজিক - অর্থনৈতিক-সাংস্কৃতিক ও শিক্ষাগত কর্মকান্ড ও লক্ষণীয়। বলা বাহুল্য এর প্রতিক্রিয়া প্রতিবেশী হিন্দীভাষী রাজ্যগুলিতেও পড়েছিল। দক্ষিনের প্রদেশগুলির তুলনায় হিন্দীভাষী রাজ্যগুলিতেই বেশী পড়েছিল। ভারতবর্ষে আন্তঃ প্রাদেশিক সাহিত্যিক লেনদেনের ইতিহাসে এই সংযোগ উভয় ভাষার উপন্যাসকেই সমৃদ্ধ করেছে। সময়ের সাথে সাথে হিন্দী সাহিত্যে উপন্যাস সুকীয়তা অর্জন করেছে, হিন্দীর অনুবাদ শাখা অনেক বেশী এগিয়ে গিয়েছে। বাংলা ও হিন্দী ভাষায় রচিত উপন্যাসের ভাববিনিময়ের ঐতিহ্যমন্ডিত সম্পর্কে কখনো ফাটল ধরেনি, তা আজো অক্ষুন্ন আছে।

১। 'ভারতীয় উপন্যাসের প্রথম যুগ' : মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়।
জিজ্ঞাসা (সম্পাদক : শিবনারায়ন রায়) কলকাতা, শ্রাবণ - আশ্বিন।
পৃঃ ১১৭

২। ঐ পৃঃ ১১৭

৩। History of Hindi Literature; F.E.Key. 3rded. Calcutta, Y.M.C.A. Publs. House, 1960. p.84.

৪। আধুনিক হিন্দী সাহিত্যে বাংলার স্থান(১ম খন্ড) সুধাকর চট্টোপাধ্যায়।
কলকাতা, শরৎ পুস্তকালয়, ১৩৬৪। পৃঃ ১৪-১৫

৫। 'বিদ্যাসাগরের বাঙ্গালাদেব চরিত গ্রন্থের প্রামানিকতা ও সম্ভাব্য হিন্দীমূল'
: সুধাকর চট্টোপাধ্যায়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা সাহিত্য পত্রিকা, ১৯৬২।
পৃঃ ১৬২

৬। 'হিন্দী অমিত্রাক্ষর ও মধুসূদন : রামবহাল তেওয়ারী। চতুষ্কোণ, কলকাতা,
বৈশাখ, ১৩৬০। পৃঃ ২০৮

৭। 'ভারতীয় উপন্যাসের প্রথম যুগ' : মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়।
জিজ্ঞাসা (সম্পাদক : শিবনারায়ণ রায়) কলকাতা, শ্রাবণ - আশ্বিন, ১৩৬৯।
পৃঃ ১১৭

৮। সাহিত্য-যুগধর ভারতেন্দু হরিশচন্দ্র : প্রতাপ চন্দ্র চন্দ্র। কলকাতা, রবীন্দ্র
ভারতী সোসাইটি, ১৩৯২। পৃঃ ২৫

৯। ঐ পৃঃ ৪৬- ৪৭

১০। আলেখ্য (বংকিম সার্দ্ধশত জন্মজয়ন্তী সংখ্যা) সম্পাদক : মিতীশ চন্দ্র ঘোষাল,
কলকাতা, ১৩৯৪। পৃঃ ১৭

১১। সাহিত্য-যুগধর ভারতেন্দু হরিশচন্দ্র : প্রতাপ চন্দ্র চন্দ্র। কলকাতা, রবীন্দ্র ভারতী
সোসাইটি, ১৩৯২। পৃঃ ২৫

১২। হিন্দী সাহিত্য কা ইতিহাস : সম্পাদক, ডাঃ নগেন্দ্র। নয়াদিল্লী, ন্যাশনাল পাবলিশিং হাউস, ১৯৭৬। পৃঃ ৪৮২

১৩। History of modern Indian Literature; ed. by S.P. Sen. Calcutta, Institute of Historical Studies, 1975, p.85.

১৪। হিন্দী সাহিত্য কা ইতিহাস : সম্পাদক, ডাঃ নগেন্দ্র। নয়াদিল্লী, ন্যাশনাল পাবলিশিং হাউস, ১৯৭৬। পৃঃ ৪৮৩

১৫। ঐ পৃঃ ৪৮৪

১৬। 'হিন্দী সাহিত্যে শরৎচন্দ্র' : রাম বহাল তেওয়ারী। অনুবাদ পত্রিকা (সম্পাদক : সুরাজ সেনগুপ্ত ও অন্যান্য) কলকাতা, জুলাই - সেপ্টেম্বর, ১৯৭৬। পৃঃ ২৮

১৭। 'ভারতীয় মধ্যবিত্ত সমাজ ও শরৎচন্দ্র' : অরুণ কুমার মুখোপাধ্যায়। সাহিত্য সংস্কৃতি (সম্পাদক : সঞ্জীব কুমার বসু) কলকাতা, শারদীয়া সংখ্যা, শ্রাবণ - আশ্বিন, ১৯৮২। পৃঃ ১১৩-১১৫

১৮। আধুনিক হিন্দী সাহিত্যে বাংলার স্থান(১ম খণ্ড) : সুধাকর চট্টোপাধ্যায়। কলকাতা, শরৎ পুস্তকালয়, ১৩৬৪। পৃঃ ২৩-২৪

১৯। ঐ পৃঃ ২৮

২০। বাংলা সাময়িক পত্র : ১২২৫(ইং ১৮১৮) - ১২৭৪ (ইং ১৮৬৮) ব্রজেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। কলিকাতা, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, ১৩৫৪। পৃঃ - ৭৩

২১। আধুনিক হিন্দী সাহিত্যে বাংলার স্থান(১ম খণ্ড) : সুধাকর চট্টোপাধ্যায়। কলকাতা, শরৎ পুস্তকালয়, ১৩৬৪। পৃঃ-২৫